সংকটে গৌড়
(সূচনা পর্ব)

সংকটে গৌড়
(সূচনা পর্ব)

অঙ্গিরা দত্ত দণ্ডপাট

CHARYA PUBLISHERS

SANGKATE GOUR (SUCHANA PARBA)
A Historical Thriller Novel by Angira Datta Dandapat
Published by Charya Publishers
© Angira Datta Dandapat

প্রথম প্রকাশ:
মে, ২০২৪
পুনর্মুদ্রণ:
অক্টোবর, ২০২৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ:
তমোজিৎ দেব

বর্ণশুদ্ধি:
শুভ রায়চৌধুরী

মুদ্রক:
বসু মুদ্রণ
১৯/এ, সিকদার বাগান স্ট্রীট
কলকাতা: ৭০০ ০০৪

প্রকাশক:
অঙ্গিরা দত্ত দন্ডপাট
চর্যা পাবলিশার্স
মেদিনীপুর ৭২১ ১০১
যোগাযোগ: ৬২৯৬৮২৫৩৭১
ই-মেইল: charyapublishers@gmail.com

প্রকাশক বা স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সুযোগ সম্বলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

মালিকের পদপ্রান্তে...

দাদুভাই আর মামমাম আজ ধরাধামে থাকলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন।
আমার সেই পাঠকেরা, যারা আমার কলমের ওপর ভরসা করেন, আমার
লেখা পড়তে ভালোবাসেন— তাদের উৎসাহেই এই বই।

লেখকের কথা

সময়টা অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিক। গৌড়বঙ্গের সিংহাসনে সম্রাট ধর্মপাল। তিনি উত্তরাপথস্বামী। তিনি 'গান্ধার থেকে জলধি শেষ' পর্যন্ত বাঙালির সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন। তাঁর হস্তিবাহিনীর গর্জন শুনে স্বর্গে দেবতারাও আতঙ্কিত হন। কিন্তু তাঁর সবথেকে বড় গুণ ছিল প্রজাবৎসলতা। গ্রামের রাখাল থেকে ধনী পরিবারের শুকপাখি পর্যন্ত নিয়ত তাঁর যশোগান করত। লোকে বলত তাঁকে দর্শন করলে নল, পৃথু, রাম, যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যশ্লোক নৃপতিদের দর্শনের সৌভাগ্য হয়। পঞ্চাশটিরও বেশি জগদ্বিখ্যাত মহাবিহার তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে বাঙালির শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কাছে জ্ঞানলাভের জন্য আসেন সমস্ত বিশ্বের শিক্ষার্থীরা। এক কথায়, সেই সময়টা বাঙালির এক স্বর্ণযুগ। কিন্তু ইতিহাসে নিষ্কণ্টক শান্তি বড় দুর্লভ বিষয়। এহেন সুশাসনের মধ্যেও শত্রুরা মাথা তোলে। বাইরের শত্রু প্রতিহার রাষ্ট্র, উৎকল। শুধু কি তাই, আরও কিছু বিক্ষুব্ধ মানুষ রয়েছেন, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন যুদ্ধ-বিগ্রহে হঠাৎই যাদের নিরুপদ্রব জীবনে আঁধার ঘনিয়েছিল, তাদের প্রতিহিংসার বিষ সমস্ত গৌড়বঙ্গকে জর্জরিত করতে চায়। স্বজনহারা-পরিচিতিহারা সেই দুর্ভাগা অকিঞ্চিৎকর কয়েকটি প্রতিহিংসার তুষানলে জর্জরিত বিপথগামী মানুষগুলির গৌড়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নিয়েই এই কাহিনি। ষড়যন্ত্রের মূলে আছে বড় দুঃখ, বড় কান্নাভেজা অতীত। আবার কোনও অতিসাধারণ মানুষ ঘটনা পরম্পরায় হয়ে ওঠেন অসাধারণ, যার মেধার আলো ষড়যন্ত্রের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে ভেদ করে সত্যকে চিনিয়ে দেয়। বাঙালির ইতিহাসের এমনই এক চমকপ্রদ সময়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে 'সংকটে গৌড় (সূচনা পর্ব)'। এখানে ইতিহাসের ভূমিকা বাঁধুনির। কাহিনির মানবিক সুরই প্রধান চালিকাশক্তি। এ-কাহিনি তাই কাল্পনিক হয়েও ইতিহাসের যুক্তিতে সিদ্ধ।

বইটি লেখার সময় ভেবেছিলাম বাংলার শশাঙ্ক-কাল ব্যতীত যে গৌরবময় যুগ, পাল সাম্রাজ্যের সময়কালটিকে কেন্দ্র করে গল্প লিখব। গল্প

লেখা সম্পূর্ণরূপে টিম-ওয়ার্ক; বিশেষত আমি যে ধরনের আখ্যান লিখি, তার জন্য আমার নিজের মেধাশ্রমের পাশাপাশি অনেক মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম থাকে। 'সংকটে গৌড়' ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত সম্পূর্ণ একটি ক্রাইম-থ্রিলার, যেটা লেখার প্রধান উৎসাহদাতা আমার পাঠকেরা। কাহিনিতে উল্লিখিত চরিত্রগুলির কয়েকটি সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক চরিত্র, যেমন— যুবরাজ দেবপাল, মন্ত্রী দর্ভপাণি, মহামন্ত্রী গর্গ মিশ্র প্রমুখ। আর কয়েকটি চরিত্র কাল্পনিক, বিশেষত প্রধান চরিত্র ভিক্ষু সহস্রাক্ষি সম্পূর্ণ কাল্পনিক চরিত্র, কিন্তু চরিত্রটি নির্মাণকালে আমরা লক্ষ্য রেখেছিলাম তৎকালীন রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং ধর্মীয় পরিবেশের কথা। সে সময়কার গৌড়-বঙ্গের ভৌগলিক পরিধি, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উত্থানের সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কাহিনিটিতে।

ঐতিহাসিক তথ্য বিষয়ক আলোচনা, তর্ক, প্রতিটি তথ্য বারবার মিলিয়ে দেখার কাজটিতে আমার সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে যোগ্য সঙ্গত করেছেন আমার অনুজ সুলেখক রক্তিম মুখার্জি। গল্পের কিছু চরিত্র নির্মাণে, বিশেষত নেতিবাচক চরিত্র নির্মাণে এবং চরিত্রটিকে রক্তমাংসের করে তুলতে প্রধানত সহায়তা করেছেন সুলেখক সৌরভ ঘোষ। শিল্পী তমোজিৎ দেবের শিল্প নৈপুণ্যে সেজে উঠেছে বইটি, অলংকরণ এবং প্রচ্ছদের দায়িত্ব যথাযথ ভাবে সামলেছেন তিনি। সর্বোপরি সম্পূর্ণ গল্প পুঙ্খানুপুঙ্খ সম্পাদনা ও সংশোধন করে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার উপযোগী করেছেন সুলেখক শুভ রায়চৌধুরী।

'সংকটে গৌড় (সূচনা পর্ব)' পাঠকদের হাতে, আপনাদের পছন্দ হলেই সমস্ত পরিশ্রম সার্থক।

ধন্যবাদান্তে,

অঙ্গিরা দত্ত দন্ডপাট

মেদিনীপুর, মে ২০২৪

|| এক ||

গভীর রাত্রি, চারিদিক তমসাচ্ছন্ন। বিহারের কিশোর শিক্ষার্থী এবং ভিক্ষুরা নিদ্রায় অভিভূত। সংঘরামের মুখ্যদ্বারের দুই দিকের মশালদানিতে জ্বলন্ত মশাল দুটি নিভু-নিভু। মুখ্যদ্বারের নিকটেই একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, কক্ষটি দ্বারপাল ভিক্ষুদের রাত্রিকালীন শয়নের জন্য নির্দিষ্ট। বিগত কয়েক দিন ভিক্ষু বীরপল একাই রাত্রিকালীন দ্বারীর ভূমিকা পালন করছে। সংঘের নিয়মানুসারে যুবক ভিক্ষুরা পর্যায়ক্রমে এক পক্ষকাল করে রাতে এই কক্ষে অবস্থান করে দ্বার রক্ষা করে।

পাহারায় ভিক্ষু বীরপলের পালা চলছে, এখানে অবস্থানের দরুন বীরপল খানিক সজাগ হয়েই গত কয়েকটি রাতে শয্যাগ্রহণ করেছিল, তেমনটাই নিয়ম। যদিও বিগত কয়েক রাত সে মায়াবিষ্টের মতো ঘুমিয়েছে, ভোরে বাদ্যযন্ত্রসহ প্রার্থনার শব্দে তার নিদ্রা ভেঙেছে— তখন সংঘরাম জেগে উঠেছে, প্রার্থনা কক্ষে অধিষ্ঠাত্র দেবতা অক্ষোভ্য দেবের বন্দনায় ভিক্ষুরা ব্যপ্ত, পুণ্য মন্ত্রধ্বনি প্রার্থনা কক্ষের বাইরে মুখ্যদ্বার সংলগ্ন দ্বারীর ক্ষুদ্র কক্ষটিতে এসে পৌঁছেছে।

অপরাধবোধ জেগেছিল, মনে জমা হয়েছিল প্রবল গ্লানি। নাহ্, এ বড় লজ্জার কথা, দায়িত্বজ্ঞানহীন সে কোনও কালেই নয়, অথচ পরপর তিন রাত কীভাবে এমন মরণ ঘুমে সে অঘোরে ঘুমল! শরীরে ব্যাধির চিহ্নমাত্র নেই, তাহলে এমন বেনিয়মি নিদ্রার কারণ কী! যদি কোনও অতিথি আসতেন, তাহলে তাদের বাইরে খোলা আকাশের নীচে এই অগ্রহায়ণের শীতে রাত কাটাতে হতো! অন্যান্য ভিক্ষুরা জানলে লজ্জায় মুখ দেখানো দুষ্কর— এমনটা ভেবে ভিক্ষু বীরপল নিজের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আজ সে খুবই সজাগ, অজ্ঞানের মতো ঘুম তার জন্য নয়।

সারাদিন সে আনমনা হয়ে ছিল, মনে মনে নিজেকে শতবার ধিক্কার দিয়েছে, প্রতিজ্ঞা করেছে যে ক'দিন তাকে দ্বারীর দায়িত্ব পালন করতে হবে, সে যে-প্রকারেই হোক সজাগ থাকবে। আজ সন্ধ্যায় ভোজনকক্ষ থেকে তার জন্য পাঠানো রাত্রিকালীন আহার দুশ্চিন্তায় ভালো করে খেতে পারেনি। সুমিষ্ট পায়েসটিতে আজ আর তার হাতই পড়েনি, আনমনে সে ভুক্তাবশিষ্ট পাতে রেখেই খাদ্যগ্রহণ পর্ব শেষ করেছে। আজ রাতে সে সজাগ, সচেতন— কোনওভাবেই নিদ্রার বশীভূত হবে না।

যদিও সায়াহ্ন উত্তীর্ণ হলেই বিহারের প্রধানদ্বার রুদ্ধ করা হয়, তথাপি খুব প্রয়োজনে, বিশেষত দূরদুরান্ত থেকে নবীন শিক্ষার্থীদের পরিবারের সদস্যদের এবং পথশ্রমে ক্লান্ত বণিকদলদের আগমনে দ্বার খুলে বিহার সংলগ্ন অতিথি নিবাসে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আর পাঁচটি বিহারের মতো এখানেও আলাদা করে কোনও রাজকীয় প্রহরীর ব্যবস্থা নেই। অতিথি নিবাসটিতে সবসময়ই জনসমাগম থাকে, শিক্ষার্থীদের পরিজন ব্যতিরেকে বহু বণিক বাণিজ্যপথের পাশে এই স্থানে বিশ্রাম নেন। কাশীর পথে এই বৌদ্ধ-বিহারটি বণিকদের উত্তর-পথে বাণিজ্যযাত্রার অন্যতম বিশ্রামস্থান।

মহাপদ্মরাগ বিহারটি প্রধানত আবাসিক বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় সংঘরামে বিস্তৃত। সংঘরামে স্তূপ চৈত্য এবং বেশ কয়েকটি প্রার্থনা কক্ষের সঙ্গে রয়েছে ভিক্ষুদের আবাসস্থল, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র, রন্ধনশালা, ভোজনকক্ষ, গোশালা, বাগান পরিচর্যাকারী এবং গোশালা ও অশ্বশালার সেবকদের নির্দিষ্ট স্থান— যেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র নগর। এই বিহারটির শিক্ষাকেন্দ্র তিনটি— প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও অপরটি ভিক্ষু হওয়ার জন্য যারা আসেন তাদের সংঘ উপযোগী করে তোলার নিমিত্ত শিক্ষাকেন্দ্র। প্রথাগত বিদ্যা শিক্ষান্তে এখানকার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি দেয় নিকটস্থ নালন্দা অথবা ওদন্তপুরী মহাবিহারে। আবার উলটোটিও ঘটে প্রায়শই, উচ্চশিক্ষা শেষে বহু যুবক এখানে আসে ভিক্ষু হওয়ার পাঠ নিতে, নিজেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলতে।

মন বিক্ষিপ্ত, শয্যায় কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর উঠে বসল ভিক্ষু বীরপল। কুটীরের দ্বার খুলে বাইরে আসতেই শীতল বাতাসের ঝাপটায় একেবারে কেঁপে গেল সে। বহু পূর্বে মগধী ঠান্ডায় কোশলরাজ প্রসেনজিৎ রাজগৃহের বন্ধ নগরদ্বারের বাইরে সেই নিম্ন তাপমাত্রা সহ্য

করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, মনে পড়ে গেল সে কথা। নাহ্, সংঘরামের দ্বারপালকে সজাগ থাকতেই হবে, এই প্রবল ঠান্ডায় অভিতাভের সংঘের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে কেউ আশ্রয় পাবে না, এ হতে পারে না। দ্বার রুদ্ধ করে শয্যায় এসে উপবেশ করল।

রাজগৃহ এই মহাপদ্মরাগ বিহার হতে তিন যোজনের পথ, সংঘরামের গা-ঘেঁষে অনুচ্চ ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের সুদীর্ঘ বিস্তৃত শৃঙ্খল যা এগিয়ে গেছে বৌদ্ধবিহারের সীমানা ছাড়িয়ে আরও বহু দূরে। স্থানে স্থানে অনুচ্চ পাহাড়ের কোলে রয়েছে গুহা— প্রাকৃতিক কয়েকটি গুহা থাকলেও মনুষ্যনির্মিত গুহার সংখ্যাই অধিক। সুদূর অতীতে মহারাজ অশোকের সময়কালে অজীবক সম্প্রদায়ের জন্য প্রিয়দর্শিনী সম্রাট তৈরি করেছিলেন কিছু গুহা। আর কিছু রয়েছে গুহা-সংঘরাম, স্তূপ, চৈত্যসহ। অতীতকাল থেকেই রয়ে গেছে সংঘরামগুলি। নিভৃতে পাহাড়ের কোলে জনসমাজ থেকে দূরে যুগ যুগ ধরে অন্তর-আলোকে আলোকিত হয়েছেন কত শত প্রাচীন ভিক্ষু।

কুলুঙ্গিতে থাকা প্রদীপে কিছুটা রেড়ির তেল ঢেলে শিখাটি উস্কে দিতেই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল শিখাটি। নাহ্, মার আর তাকে বশীভূত করতে পারবে না, তাকে দায়িত্বপালন থেকে থামাতে পারবে না, মৃতবৎ নিদ্রাকে সে আজ পরাহত করবেই... ঝুলি থেকে প্রজ্ঞাপারমিতা বের করে প্রদীপটিকে শয্যায় রেখে পুঁথিতে মনোনিবেশ করল সে।

কেটে গেছে বেশ কিছুক্ষণ, চারিদিক নিঃস্তব্ধ। প্রজ্ঞাপারমিতায় বুঁদ নবীন ভিক্ষু। হঠাৎ মৃদু খস্ খস্ শব্দ, তন্ময়তা কাটল না ভিক্ষু বীরপলের। এবার অপেক্ষাকৃত জোরে একটু শব্দ, কে যেন মৃদু পদক্ষেপে এগিয়ে গেল। এবার কিন্তু তার কানে প্রবেশ করল সেই মৃদু শব্দ, এবং সচকিতে উঠে দাঁড়াল বীরপল। এত রাতে এদিকে কে যায়? ডান দিকে যেন পদশব্দটি মিলিয়ে গেল। গায়ে মোটা চিবরটা ভালো করে জড়িয়ে প্রদীপ হাতে কক্ষ থেকে বেরিয়ে চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখল কোনও জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। সীমানা প্রাচীর বরাবর দেওয়ালে আলোকপ্রদানকারী মশালগুলো ম্লান হয়ে জ্বলছে। সম্মুখে সংঘরামের মূল ভবনের চূড়ায় আলোক শিখা দেখা যাচ্ছে, চারিদিক নিস্তব্ধ। তাহলে হয়তো মনের ভুল। হাতের প্রদীপটির শিখা হাওয়ার ঝাপটা থেকে অপর হাতের আড়ালে

বাঁচিয়ে প্রধাণ দ্বারের দিকে এগিয়ে গেল বীরপল। না, কেউ কোথাও নেই। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল সে, ভীষণ ঠান্ডায় বস্ত্র ভেদ করে সারা শরীরে যেন বরফের শলাকা ফুটছে। মনের ভুল একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে ফিরে গেল আপন কক্ষে। আবার প্রদীপের আলোয় পুঁথি খুলে বসল।

সুতো ছিঁড়ে গেলে গিঁট দিয়ে কাজ চালানো যায় ঠিকই, মনসংযোগ একবার নষ্ট হলে তা ফিরিয়ে আনা খুবই কষ্টসাধ্য। পুঁথিতে চোখ থাকলেও, মন থাকল না। বিবিধ বিষয় মস্তিষ্কে একটার পর একটা চিন্তা স্রোতের ঢেউ তুলতে লাগল। আজ তার চোখে নিদ্রাদেবীর আগমন ঘটেনি, এটাই স্বাভাবিক। বহু দিন পরে এই হিমেল রাতে মনে পড়ল পুরনো দিনের কথা, মনের গ্লানির থেকেই মুক্তি পেতে হয়তো মন ছুটে গেল অতীতের দিনগুলিতে।

বাল্যকালে পিতার হাত ধরে এই মহাপদ্মরাগ বিদ্যালয়ে প্রবেশ, এখানকার শিক্ষাশেষে সুযোগ এসেছিল উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য নালন্দা মহাবিহারে গমনের। ততদিনে পিতা-মাতার মৃত্যু হয়েছে, বড় নির্মম সেই মৃত্যু। মালব সীমান্তের নিকটবর্তী খর-পাথুরে অঞ্চলের সীমান্তবর্তী বিল্বদান গ্রামটির দুর্ভাগ্য যে, সেটি পড়েছিল সেনাবাহিনীর গমন-পথে। গুর্জর-প্রতিহারদের একটি শাখা মালবের দিক থেকে হঠাৎই আক্রমণ করেছিল। তড়িৎগতিতে ঘোড়সওয়াররা ঢুকে পড়েছিল গ্রামের সীমানায়, লুটপাটের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিসংযোগ করেছিল গোটা গ্রামে। গ্রামবাসীদের একমাত্র অপরাধ ছিল— তাদের উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ তারা দীর্ঘ দশ-বারো বছর গৌড়পতিকে প্রদান করত। তারা না বুঝত রাজনীতি, না বুঝত কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব, তবে যুদ্ধ তাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল তার নৃশংসতা। প্রাণ দিয়ে চোকাতে হয়েছিল মূল্য। যে কয়েকজন বেঁচে ছিল তাদের মধ্যে একজন বীরপলের পিতৃব্য, ঘটনার বেশ কয়েকমাস পরে তিনি সংঘরামে এসে এই মর্মান্তিক খবরটি দেন বীরপলকে। পিতা-মাতার মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে পারেনি বীরপল। উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা তখন তার মন থেকে দূরীভূত, সংসারের সঙ্গে সূত্র শিথিল হয়ে গেছে। সংঘাধ্যক্ষ আচার্য জ্ঞানশ্রীর নিকট ব্যক্ত করে তার মনোবাঞ্ছা, সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষু জীবনযাপন করতে চায়।

বীরপলের দ্বারপাল-কুটীরে প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল পরেই আপাদমস্ত বস্ত্রাবৃত একটি মূর্তি প্রধানদ্বার সংলগ্ন থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল, নিশ্চিত হল আশ-পাশে কেউ নেই, মার্জারগতিতে এগিয়ে চলল দ্বারপাল-কক্ষের দিকে। বন্ধ দরজার ওপাশ হতে দরজার ঘুলঘুলি দিয়ে কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে চুপিসারে ফিরে গেল ভিক্ষু নিবাসের দিকে, মুখে তার অসন্তোষের রেখা স্পষ্ট, বিড়বিড় করে বলল, "এ জেগে আছে কোন উপায়ে, তাহলে কি আহিফেনের আকর পায়েসে মেশাতে বিস্মৃত হয়েছে ভেল্লরু!"

ভিক্ষু বীরপলের পুরনো কথা মনে পড়ায় মন খানিক তরল ছিল, জমে ছিল বাষ্প। পুঁথি বন্ধ করে উঠে বসল সে। পিপাসা পেয়েছে, জলের পাত্রটির দিকে এগিয়ে গেল।

জলের পাত্রটির পাশেই পড়ে আছে খাবারের থালা, তাতে তার ভুক্তাবশেষ। অনেকটি খাদ্য আজ নষ্ট হয়েছে তার দ্বারা, মনে মনে লজ্জিত হল, খাদ্যবস্তু নষ্ট করা মহাপাপ। বিশেষত সুমিষ্ট পায়েসটিও পড়ে আছে।

এরপর কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল সে, তবে সে পাতলা ঘুম, সজাগ থাকা। নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম ভাঙল, তখনও ভোরের আলো ফোটেনি, এবার প্রার্থনা গৃহে প্রাতঃবন্দনাগান শুরু হবে।

সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটেছে, অতিথিশালা থেকে নির্গত হল একটি বণিকের দল, তারা গতকাল গোধূলিবেলায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল বিহারে। উৎকলদেশীয় বণিকের দলটি যেন ভোরের অপেক্ষাতেই ছিল, বীরপল মুখ্যদ্বার খুলে দিতেই কিছুটা তড়িঘড়ি বিহার ত্যাগ করল।

|| দুই ||

স্বাভাবিক ছন্দে শুরু হল দিন। ভিক্ষু বীরপল প্রাতঃবন্দনা শেষে সংঘাধ্যক্ষের সাক্ষাৎপ্রার্থী হল। সংঘাচার্যের সম্মুখে সে জানাল কয়েক রাত অজ্ঞানের মতো নিদ্রার কথা, চাইল এই দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য শাস্তি। মহাস্থবির জ্ঞানশ্রী প্রাজ্ঞ, অতিপ্রাচীন ভিক্ষু। তিনি বললেন, "বৎস তোমার মধ্যে যে

গ্লানির সৃষ্টি হয়েছে তাতেই তোমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আত্মগ্লানিই একমাত্র প্রকৃত প্রায়শ্চিত্তের পথ।”

ভিক্ষু বীরপল হাঁটুগেড়ে মহাস্থবিরের আসনের সামনে যুক্তকরে বসে বলল, “ভন্তে, অনুগ্রহ করে পরপর তিন দিন সারা দিন সারা রাত আমাকে দ্বারী নিযুক্ত করে প্রায়শ্চিত্ত করতে অনুমতি দিন।”

দিবাভাগে দ্বারী পরিবর্তন হওয়াই দস্তুর। যুবক ভিক্ষুটিকে সংঘাধ্যক্ষ আচার্য জ্ঞানশ্রী বহুকাল চেনেন। বীরপলের মনে আত্মগ্লানির উদ্রেক হয়েছে এবং আন্তরিকভাবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে আগ্রহী দেখে তিনি আর না করলেন না। অনুমতি দিলেন পরপর তিন দিন তিন রাত তাকে দ্বারী থাকতে। তিনি বললেন, “তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক, অনুমতি দিলাম। তবে দিবাকালের স্নানাহার ও রাত্রিকালীন আহার অন্য সকল ভিক্ষুদের মতো সমাধা করবে, সকলের থেকে সারা দিন বিচ্ছিন্ন থাকার প্রয়োজন নেই। সামান্য বিশ্রাম নেবে, দু’বেলা ওই সময়টুকু তোমার অনুপস্থিতিতে ভিক্ষু সহস্রাক্ষি দ্বারী নিযুক্ত হবে।”

প্রাজ্ঞ ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, শীর্ণকায় দেহখানি বয়সের ভারে খানিক ন্যুব্জ। সংসারত্যাগী পরমজ্ঞানী বর্ষীয়ান ভিক্ষুর অন্তরে স্নেহের ফল্গুধারা শতপ্রবাহিত। সেবক ভিক্ষুকে নির্দেশ দিলেন নবীন ভিক্ষু সহস্রাক্ষিকে আহ্বানের।

বীরপলকে বললেন, “বৎস, চিন্তামুক্ত হও, ভগবান তথাগতের করুণায় তোমার মনের গ্লানি দূরীভূত হোক।”

ভিক্ষু বীরপল চলে গেছে, সংঘাধ্যক্ষ জ্ঞানশ্রী পদ্মবীজের মালা হাতে নিশ্চুপ হয়ে আত্মস্থ। অপেক্ষা করছেন ভিক্ষু সহস্রাক্ষির। সহস্রাক্ষি স্বভাব-কিশোর, চাঞ্চল্য এখনও কমেনি। নবীন ভিক্ষুটি ওদন্তপুরী মহাবিহার থেকে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে এই মহাপদ্মরাগ বিহারে আচার্যরূপে যোগদান করেছ। অল্পকালের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় সে, প্রতিটি কাজে তার উৎসাহ।

সেবকের সঙ্গে ঈষৎ হৃষ্টপুষ্ট মুণ্ডিত মস্তক সহস্রাক্ষি এসে উপস্থিত হল বৃদ্ধ মহাস্থবিরের সম্মুখে। যুক্তকরে নমস্কার জানানোর পরে ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী বললেন, “বৎস, আজ আগামীকাল এবং আগামী-পরশু তোমাকে দ্বারপাল-কক্ষে থেকে কিছুক্ষণ দ্বারীর কাজ করতে হবে। ভিক্ষু বীরপলকে দুইবেলা

আহারাদি এবং বিশ্রামের জন্য অনুমতি দিয়েছি। সেই সময়টুকু তোমাকে দ্বারীর ভূমিকা পালন করতে হবে।”

ভিক্ষু সহস্রাক্ষি বলল, “যথা আজ্ঞা।”

তারপর ইতস্তত করে বলল, “ভন্তে, একটি নিবেদন আছে।”

স্মিত হাসির রেখা ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখমণ্ডলে, সেদিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল নবীন ভিক্ষু, মনে মনে ভাবল, “যা! ধরা পড়ে গেছি!”

প্রাচীন ভিক্ষু নবীন ভিক্ষুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “বণিক চারুদত্ত বারানসী থেকে বাণিজ্যশেষে ফিরেছেন, পুত্র সুবল, অর্থাৎ তোমার বয়স্যও পিতার সঙ্গে ফিরেছে। তাই তো?”

বৃদ্ধের চোখে কৌতুকের ছায়া, সারাটা জীবন আত্মজ্ঞানের চর্চা করলেও সূক্ষ্মরস বোধের, মানবিকগুণের কোনও কমতি নেই মহাজ্ঞানী পরম ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর। নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে সহস্রাক্ষি, কৈশোরকাল থেকে বণিকপুত্র সুবলের সঙ্গে তার মিত্রতা, উভয়ে একত্রে ওদন্তপুরী মহাবিহারে পাঠ লাভ করেছে। তার পূর্বে দু’জনেই এই মহাপদ্মরাগ বিহারে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ করেছিল একত্রে। উচ্চশিক্ষা শেষে সে সংঘে যোগদান করেছে, সুবল পিতার বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেছে। বেশ কয়েক মাস পরে বাণিজ্যশেষে সুবল ফিরেছে, তার সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছে, দু’জনে ঠিক করেছে— অগ্রহায়ণের মেলা বসবে নদীর তীরে, তারা দেখতে যাবে।

এই অঞ্চলের এটাই বড় মেলা। আশপাশের দশটা গ্রামের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই মেলায় আসে। বহু তান্ত্রিক, বিষবৈদ্য, জাদুকরেরা আসে। সকাল থেকে সারা রাত মেলা চলে, সূর্য অস্ত গেলে আগুন জ্বেলে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে এই প্রবল ঠান্ডায় আগুনের তাপের উষ্ণতায় সারা রাত চলে বিকিকিনি, হুল্লোড়। পরদিন ভোরে মেলা ভেঙে যায়। সেই মেলা দেখতে দু’জন যাবে।

ঈষৎ কাঁপা গলায় সহস্রাক্ষি বলল, “অগ্রহায়ণের মেলা দেখতে যাওয়ার অনুমতির জন্য...”

কথা শেষ হওয়ার পূর্বেই জ্ঞানশ্রী বললেন, “যেতে পারো, তবে বেলা থাকতে থাকতে ফিরবে। কোনওভাবেই যেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ না হয়। আজই তো মেলা?”

সহস্রাক্ষি হ্যাঁ-বাচক ঘাড় আন্দোলিত করে বলল, “আজই মেলা। অনুগ্রহ করে আজকের দিনটি ভিক্ষু বীরপলের ভোজনগৃহে থাকাকালীন দ্বারীর কাজটি থেকে অব্যাহতি দিন।”

অন্য কেউ হলে সংঘাধ্যক্ষের আদেশের পরে মেলা দেখার মতো জাগতিক তুচ্ছ বিষয়ের অনুরোধ করার কথা ভাবতে পারত না। কিন্তু এই নবীন ভিক্ষুটি বরাবরই অন্যরকম, কৈশোরকাল সদ্য পেরিয়ে এলেও যুবক এই ভিক্ষুর মনটি এখনও সবুজ, দেহের গঠনও অনেকটা কিশোরসুলভ। আচার্য পদ লাভ করেছে, প্রতিটি কর্মে, দায়িত্বপালনে বুদ্ধির, বিচক্ষণতার ছাপ প্রবল। স্বয়ং জ্ঞানশ্রীর নজরে পড়েছে সেই বুদ্ধির ঝলক, বারবার। অভিজ্ঞ সংঘাচার্য বুঝেছেন এই নবীন ভিক্ষু একটি অমূল্য রত্নবিশেষ, একে অনায়াসে ভরসা করা যায়, বিশ্বাস করা যায়। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, “আজ আমি অন্য কাউকে দ্বারপালের কক্ষে পাঠিয়ে দেব।”

সহস্রাক্ষির মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নত হয়ে প্রণাম জানিয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। সুবলকে খবর পাঠাতে হবে, অনুমতি পাওয়া গেছে। প্রতিবারের মতো বিষবৈদ্যরা দলবেঁধে মেলায় আসবে, অহিতুণ্ডদের বীণের সুরে কুচকুচে কালো সাক্ষাৎ মৃত্যু ফণা দুলিয়ে নাচবে। অহিতুণ্ডের মতো সেও যদি ওই রকম বিষধর সাপদের বীণের তালে নাচাতে পারত! ঘাড়টা ধরে বিষ নিষ্কাশনের শিক্ষা পেলেও খুব প্রয়োজন ছাড়া তা প্রয়োগ করার অনুমতি আচার্য দেননি। ওদন্তপুরীতে শিক্ষাগ্রহণকালে বিষ নিষ্কাশন ও সর্পদৃষ্ট রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতি শিখেছিল ঠিকই, কিন্তু সাপ ধরার পদ্ধতি তার জানা থাকলেও খুব প্রয়োজন ছাড়া তা প্রয়োগের অনুমতি আচার্য বসুবন্ধুর থেকে পাওয়া যায়নি। অধ্যাপক বসুবন্ধু শীল মহাশয় শিক্ষার্থীদের হাতে ধরে বিবিধ বিষের বিষক্রিয়াজনিত লক্ষণ, নিরাময় পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন, দংশনস্থান দেখে বিষের তীব্রতা ও ধরণের পার্থক্য চিনিয়ে ছিলেন। বিষধর সর্পকে নিজ হাতে আয়ত্ত করার কৌশল শেখালেও বারবার সাবধান করেছিলেন। ছাত্রদের খুব সাবধানে রাখতেন, বিষ নিষ্কাশন পদ্ধতি শেখাবার সময় বলতেন, “যার যা কর্ম তাকে সেটা করতে দাও, সাপ ধরা, বিষ সংগ্রহ করা তোমাদের কর্ম নয়, অহিতুণ্ডদের এবং বিষবৈদ্যদের যা কর্ম তাদেরই করতে দাও, তোমাদের কর্ম সর্পদৃষ্ট রোগীকে সুস্থ করা। সাপ ধরা তোমাদের কাজ নয়।”

আচার্যের কথা মেনে চলেছে সে, তবে তার ওই অহিতুণ্ডদের সাক্ষাৎ-মৃত্যুরূপী সর্পদের হাতে নিয়ে হরেক খেল দেখানোর প্রতি আকর্ষণটা কমেনি। মেলাতে যাওয়ার উৎসাহের কারণই এই সাপের খেলা দেখা।

সহস্রাক্ষি কক্ষ হতে চলে যাওয়ার পরে ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী সেবককে বললেন, "পিপুল, তুমি বীরপলের স্নান-আহারাদি কালে দ্বারীর ভূমিকা পালন করবে।"

"যথা আজ্ঞা" বলে ভিক্ষু পিপুল পুঁথি নকল করার জন্য নিত্যদিন ব্যবহৃত জলচৌকিটি জ্ঞানশ্রীর সম্মুখে স্থাপন করল। কম কথার এই সেবকটিকে ভারী পছন্দ করেন সংঘাধ্যক্ষ, তার খুঁটিনাটি প্রয়োজনের দিকে পিপুলের সজাগ দৃষ্টি।

বেলা গড়িয়ে দুপুর হল, পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুসারে মেলা যাওয়ার আনন্দে হর্ষচিত্তে সহস্রাক্ষি নির্গত হল গ্রামের উদ্দেশে। অপর দিকে, পিপুল এসে উপস্থিত হল মুখ্যদ্বারে। বীরপল তাকে মুখ্যদ্বারের দায়িত্ব দিয়ে এগিয়ে চলল ভিক্ষু নিবাসের দিকে স্নান-আহারাদি সারতে।

আজ বীরপলের মনও প্রফুল্ল, গ্লানি অনেকাংশে দূর হয়েছে। নবীন ভিক্ষুদের জন্য নির্দিষ্ট নিবাসের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ নজর পড়ল বাম দিকে, ওই তো ধনাগার, আচার্য রত্নদীপ্তকে কি এসময় ওখানে পাওয়া যাবে? কয়েক দিন দেখা হয়নি আচার্যের সঙ্গে, সমবায়ে হয়তো কর্মরত সকলকে মধ্যাহ্নভোজে পাঠিয়ে নিজে হিসাবপত্র একা মেলাচ্ছেন। কী মনে হল, ভিক্ষু বীরপল গতিমুখ বদলে হাঁটা দিল ধনাগারের উদ্দেশে।

জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত কখন যে মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়...

|| তিন ||

মধ্যাহ্নের এই সময়ে ধনাগারের দিকটা একপ্রকার ফাঁকাই থাকে। ধনাগারটি দুটি অংশে বিভক্ত, সামনের দিকের অংশটি সমবায়ের কাজকর্মের জন্য ব্যবহার হয় আর পশ্চাদের বৃহৎ দ্বিতল অংশটি মূলধনাগার। সমবায়ের সঙ্গে মূলধনাগার একটি লম্বা গলিপথে সংযুক্ত।

সমাবায় অংশের শুরুতে একটি বড় কক্ষ— এটিই সমবায় কক্ষ। কক্ষটির একদিকে দেওয়াল ঘেঁষে হিসাব-রক্ষকদের আসন, এবং কিছুটা তফাতে মুখোমুখি সারিবদ্ধভাবে আসন পাতা বণিকদের জন্য। একটি ক্ষুদ্র দ্বারপথে কক্ষটি সমবায়ের জন্য নির্দিষ্ট ধনসঞ্চয়াগারের সঙ্গে সংযুক্ত। সাধারণত দ্বারটি সর্বদা বন্ধ থাকে, প্রয়োজন মতো সেটি খোলা হয়।

ভিক্ষু বীরপল সমবায় কক্ষে এসে পৌঁছে দেখল কেউ কোথাও নেই, একদম ফাঁকা। আশ্চর্য! সমবায়ের প্রধান আধিকারিক আচার্য রত্নদীপ্ত গেলেন কোথায়, সাহায্যকারী ভিক্ষুরাই বা কোথায়? তারা কি সকলে একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজনে চলে গেছেন! কিন্তু আচার্য? তিনি তো কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে এভাবে ফেলে চলে যাওয়ার মানুষ নন! তাহলে?

খুব অবাক হল বীরপল। সমবায়ের দ্বার উন্মুক্ত রেখে কেউ না থাকা অসম্ভব! মনে মনে ভাবল, “একটু অপেক্ষা করা যাক।”

পরিচিত কক্ষ, আচার্য রত্নদীপ্তের সহায্যকারী রূপে এখানে সে সমবায়ের কাজকর্ম করে, বিশেষত তাকেই আচার্য ভার দেন গণনার কাজে। গবাক্ষহীন সঞ্চয় কক্ষে সে দীর্ঘ সময় ধরে সমস্ত হিসাব করে, ধনাগারের সর্বত্র তার অবাধ যাতায়াত। তবে কি আচার্য ভেতরের সঞ্চয় কক্ষে, গণনার কাজে ব্যস্ত?

আচার্যের সঙ্গে আজ তেমন কোনও প্রয়োজন তার নেই, নেহাতই কোনও কারণ ছাড়াই তার এদিকে আগমন। কয়েক দিন প্রিয় আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি, এদিকে দেরিও হয়ে যাচ্ছে। তার অনুপস্থিতিতে অপর জন দ্বারীর ভূমিকা পালন করছে। নাহ্, আজ আর অপেক্ষা করা যাবে না। উঠে দাঁড়াল সে, সমবায়ের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ধনাগারে প্রবেশের দ্বারটি ভেতরের দিক থেকে বন্ধ, সে-দিকটা খানিক অন্ধকারও। একবার কি বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে আচার্য রত্নদীপ্তের উদ্দেশে হাঁক দেবে সে, কিন্তু সেটা কি সমীচীন হবে! আচার্য কী ভাববেন! দোমনা করতে করতে বীরপল এগিয়ে গেল বন্ধ দ্বারটির দিকে। হঠাৎ ক্ষুদ্র দ্বারটির পাশে বস্ত্রনির্মিত আসনের ওপর চকচকে কিছু দেখে থমকে দাঁড়াল— একটি মুদ্রা। হয়তো ভেতরে জমা করতে নিয়ে যাওয়ার কালে অসাবধানে পড়ে গেছে। হায়, এতটুকুর জন্য কত হয়রানি হতে পারে, হিসাব মিলবে না। ঝুঁকে মুদ্রাটি তুলে নিয়ে কেমন যেন মনে হল, একটু হালকা। ইতস্তত করে মুদ্রাটি

অপর হাতে নিল— হ্যাঁ, স্বাভাবিকের তুলনায় হালকা। ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হল, গবাক্ষের পাশে এসে আলোয় ধরল মুদ্রাটিকে। অভ্যস্ত চোখে অচিরেই ধরা পড়ল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁতগুলো। চমকে উঠল বীরপল। এই মুদ্রা নকল। বিশ্বাস করতে পারল না, আবার আলোয় ধরল মুদ্রাটিকে। নাহ্, কোনও সন্দেহ নেই, এই মুদ্রা নকল। স্তব্ধ হয়ে গেল সে। দ্বার খোলার শব্দে সংবিৎ ফিরল। আচার্য রত্নদীপ্ত উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন, স্থির দৃষ্টি তার ওপর নিবন্ধ।

হতবিহ্বল ভিক্ষু বীরপল উত্তেজিত স্বরে অগোছালোভাবে বলে উঠল, "আচর্য, এই যে, দেখুন, এই মুদ্রাটি... আসনের ওপর পড়েছিল... মুদ্রাটি নকল।"

এক বিচিত্র ভাব ফুটে উঠল প্রৌঢ় আচার্যের মুখমণ্ডলে, ক্ষণকাল মাত্র, তারপর ফিরে এল প্রশস্তির ভাব। উদগ্রীব হয়ে ডান হাত প্রসারিত করে বললেন, "সেকি! এ কীভাবে সম্ভব! দেখি, দাও, মুদ্রাটি দাও আমার হাতে।"

আচার্যের প্রসারিত করতালুতে মুদ্রাটি রাখল বীরপল। উত্তেজনায় বীরপলের কপালে ঘাম-বিন্দু জমেছে। ভিক্ষু রক্তদীপ্ত মুদ্রাটি বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর মধ্যে ধরে ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন। তারও ভ্রুযুগল কুঞ্চিত হল, বীরপলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সন্দেহ হচ্ছে মুদ্রাটি আসল নয়, তবে আরও ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে।"

উত্তেজিত বীরপল বলল, "আচার্য, আমি নিশ্চিত মুদ্রাটি নকল। চলুন, এখুনি সংঘাধ্যক্ষের গোচরে আনা যাক বিষয়টি। এ যে ভয়ানক বিষয়, চলুন আচার্য।"

আচার্য রত্নদীপ্ত কিছুটা তাড়াহুড়ো করে বললেন, "সংঘাধ্যক্ষ আচার্য জ্ঞানশ্রীকে বিষয়টি জ্ঞাত করার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে মুদ্রাটির সম্পর্কে। তুমি নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছ মুদ্রাটি যদি নকল হয় তাহলে বিষয়টি কতখানি জটিল। এমন স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে চাই, বিষয়টি নিয়ে মহাস্থবির আচার্য জ্ঞানশ্রীর সঙ্গে একান্তে আলাপ করব।"

বীরপলের উত্তেজনা তখনও কমেনি, সে বলল, "আমি নিশ্চিত মুদ্রাটি নকল, তাছাড়া সঞ্চয়কক্ষের প্রবেশদ্বারের বাইরেই পড়েছিল, যদি সঞ্চিত মুদ্রার সঙ্গে মিশ্রিত..."

বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিলেন না আচার্য, "উত্তেজনা সংবরণ করো, মুদ্রাটি আসল না নকল সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য আমার সামান্য সময় প্রয়োজন, তড়িঘড়ি করার মতো এই কাজ নয়। আমি নিজে আজই কথা বলব সংঘাধ্যক্ষের সঙ্গে। প্রয়োজনে তোমাকে ডেকে নেব। যাও, অনেক বেলা হল, স্নান-আহারাদি সম্পন্ন করো। তুমি বিগত কয়েক দিন রাত্রিকালীন দ্বারীর ভূমিকা পালন করছ, এই সময় তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন। তোমার বদলে এসময় কে আছে মুখ্যদ্বারে?" আচার্যের গলায় আদেশের সুর স্পষ্ট।

ভিক্ষু বীরপল আচার্যের ইঙ্গিত বুঝতে পারল, "আচার্য, দ্বারে ভিক্ষু পিপুল আছে, সংঘাধ্যক্ষের নির্দেশে পিপুল আমার অনুপস্থিতিতে এখন দ্বারীর ভূমিকায়।"

শান্ত কণ্ঠে ভিক্ষু রত্নদীপ্ত বললেন, "পিপুল দ্বারে আছে? সংঘাধ্যক্ষের নিশ্চয়ই অসুবিধা হচ্ছে পিপুলকে ছাড়া। এসময় তোমার দেরি করাটা অনুচিত।"— বলে বীরপলের মুখের দিকে তাকালেন আচার্য, বীরপলের মুখে অসম্মতির ছাপ স্পষ্ট, নরম স্বরে বললেন, "সংঘাধ্যক্ষকে আমি বিষয়টি জানাব, বুঝতেই পারছ বিষয়টি নিয়ে সকলের সামনে আলোচনা করা যাবে না, আমি নিভৃতে ওঁর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলব। যাও, স্নানাদি সেরে ভোজন করো, আজ রাতেও তুমি দ্বারীর ভূমিকায় থাকছ?"

অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়ে বীরপল বলে, "হ্যাঁ আচার্য।"

ভিক্ষু রত্নদীপ্ত আবারও সাবধান করেন, "আমি আজই সময় করে সংঘাক্ষধ্য জ্ঞানশ্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে একথা যেন পাঁচকান না হয়।"

আচার্য রত্নদীপ্তকে নমস্কার জানিয়ে ধীর পায়ে বীরপল কক্ষের বাইরে নির্গত হল। কোথাও যেন সুর কেটে গেছে, কোথাও একটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝে ধূসর স্থান তৈরি হয়েছে, ঠিক ঠাওর করা যাচ্ছে না।

হাতে ধরে থাকা মুদ্রাটি কোমরের বস্ত্রে রেখে নিজের আসনে গিয়ে বসলেন রত্নদীপ্ত। এই সময়টাতে তিনি সহকারীদের স্নান-আহারের জন্য পাঠিয়ে দেন। নিজে সকলের শেষে সমস্ত কাজ গুছিয়ে সমবায়কক্ষের একেবারে বাইরের দ্বার রুদ্ধ করেন। প্রয়োজন ছাড়া অপরাহ্ণে সমবায়কক্ষ

খোলা হয় না, যা দেনা-পাওনার হিসেব, বণিকদের আনাগোনা সব দিবাভাগেই সম্পন্ন হয়।

নিজের আসনে গিয়ে বসলেন আচার্য, কক্ষে আর কেউ নেই। গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন..

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, নাহ্, দেরি করা যাবে না। অনেকটা বেলা গড়িয়ে গেছে। ভোরেই অতিথিশালা ত্যাগ করে তক্ষক দলবলসহ উৎকলের পথে যাত্রা শুরু করেছে। এতক্ষণে তারা বহু দূর পথ অতিক্রম করেছে সন্দেহ নেই। তক্ষক কথা রেখেছে, বাণিজ্যকালে সে আশাতীত কাজ করেছে, সমস্ত মুদ্রাগুলি সুচারুভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। বারবার সে আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছে, তারও তো ক্ষত কম নেই, হৃদয়ের স্থানটি নিরেট কালো কষ্টিপাথরে পরিবর্তন হয়েছেন! কাল রাতে তক্ষককে মুদ্রাপ্রদান কালেই হয়তো অসাবধানবশত একটি মুদ্রা পড়ে রয়ে গিয়েছিল আর বীরপলের সেটিই সম্ভবত চোখে পড়েছে।

দ্রুত চাবির গোছা হাতে নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে অভ্যস্ত হাতে দ্বারে কীলক দিয়ে চাবি ঘুরিয়ে সুরক্ষা নিশ্চিত করলেন রত্নদীপ্ত, তারপর হাঁটা দিলেন। দূর থেকে তার নজরে পড়ল মুখ্যদ্বারে এক বণিকদল। একটু এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখলেন, তার অতিপরিচিত বণিক উপল সাধু বাণিজ্যশেষে প্রত্যাবর্তন করেছেন। আর দাঁড়ালেন না সেখানে, মুখে ফুটে উঠল কূট এক হাসির রেখা। দ্রুত সেই স্থানত্যাগ করলেন।

বাণিজ্যশেষে এই সময় দলে দলে বণিকেরা প্রত্যাবর্তন করেন, প্রতিদিনই চলেছে তাদের আনাগোনা। বাণিজ্যে গমনকালেও বাণিকদলদের আনাগোনা লেগেই থাকে। এই বিহারের অবস্থানটি বাণিজ্যপথের ওপরে, সে কারণে বণিকদের অতিপছন্দের বিশ্রামস্থল এই বিহারের অতিথিশালা। এছাড়া মহাপদ্মরাগ বিহারের সমবায়টিও বণিকদের আনাগোনার অন্যতম কারণ।

আচার্যের মস্তিষ্কে চলতে লাগল ভাবনা-সূত্র...

গৌড়ীয় বণিক বাণিজ্যশেষে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে বিহারের অতিথিশালায় আশ্রয় নেবেন। তাদের মধ্যে বেশির ভাগ বণিকবরই এই বিহারের সমবায়ের সদস্য। তারা ধনরাশি গচ্ছিত রাখেন এখানকার সমবায়ের ধনভাণ্ডারে। বাণিজ্যযাত্রার সময় অনেকেই ঋণ নিয়েছেন,

অনেকেই নিজেদের সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু অর্থ নিয়েছেন। ছড়িয়ে পড়েছে অর্থ, এই অর্থই টেনে আনবে অধিক অর্থ, অধিক সমৃদ্ধি, মজবুত হবে অর্থনীতি। শক্তিশালী হবে গৌড়, আরও বিস্তৃত হবে সীমানা। সীমানা... মস্তিষ্কের অতল গভীর থেকে ভেসে এল তীব্র কোলাহলের শব্দ; ক্রন্দন, নারীকণ্ঠের বুকফাটা আর্তনাদ, শিশুর সুতীব্র চিৎকার— সব মিলেমিশে একাকার।

কুটীরের সামনে পৌঁছে দেখলেন দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর শিক্ষার্থী। তাকে দেখেই সামলে নিলেন নিজেকে, শিক্ষার্থীর দিকে এগিয়ে গেলেন। আজ তো মেঘ না চাইতেই জল, মুখে ফুটে উঠল সৌম্য হাসি।

শিক্ষার্থী অল্প বয়সী কিশোর, হাতে ঝুলন্ত সুদৃশ্য পাখির খাঁচা। আচার্য এগিয়ে আসছে দেখে কিশোর উৎসুক হয়ে নিজে কিছুটা এগিয়ে এসে সোৎসাহে বলে, "দেখুন আচার্য, আমার পাখি রাখার খাঁচা তৈরি।"

কিশোর শিক্ষার্থীর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে আচার্য রত্নদীপ্ত বলেন, "বাহ, সুন্দর বানিয়েছ পুরন্দ। অনেক বেলা হল, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, এখন তোমার পাঠের সময়, আর আমিও একটু সাধন অভ্যাসে বসব।"

পুরন্দ নিজের তৈরি খাঁচার প্রশংসা শুনে উৎফুল্ল, সহপাঠীদের বলার জন্য ব্যাকুল যে আচার্য রত্নদীপ্ত তার খাঁচার প্রশংসা করেছেন। করজোড়ে প্রণাম জানিয়ে সে চলে যেতে উদ্যত হল। সে সময় ভিক্ষু রত্নদীপ্ত বলে উঠলেন, "বৎস, একটা কাজ করতে পারবে?"

প্রিয় আচার্য তাকে কাজের কথা বলছেন, এর থেকে আনন্দের আর কিছু আছে! উৎসাহের সঙ্গে বলল, "বলুন আচার্য, আমি নিশ্চয়ই করব।"

আচার্য রত্নদীপ্ত বললেন, "তুমি মুখ্যদ্বারের দ্বারপালের কাছে যাও, ভিক্ষু পিপুল আছে ওখানে। তাকে বলো, আমি সন্ধ্যাবন্দনার পরে অধ্যক্ষ ভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করব। এখন আমি সাধন অভ্যাসে বসছি, অভ্যাসশেষে আমি সংঘাধ্যক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হব।"

এইটুকু মাত্র কাজ, পুরন্দ ভিক্ষু রত্নদীপ্তকে প্রণাম জানিয়ে মুখ্যদ্বারের দিকে গমন করল।

কুটীরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন রত্নদীপ্ত। বীরপল কতখানি সন্দেহ করেছে কে জানে! তখন বিষয়টি চাপা দেওয়া

গেলেও, ভালো করে জানতে হবে তার মনোভাব, প্রিয় আচার্যকে সে নিশ্চয়ই মনের ভাব গোপন করবে না। আর তেমন হলে...

গবাক্ষ থেকে রোদ এসে পড়েছে অভ্যন্তরে, কুটীরের ভেতরটি আলোকিত। কুলুঙ্গিতে রাখা চকমকি পাথর দুটি ঘষে, প্রদীপে অগ্নিসংযোজন করে কুটীরের একমাত্র গবাক্ষটি বন্ধ করে দিলেন তিনি। বস্ত্রে নিজেকে আপাদমস্তক জড়িয়ে জ্বলন্ত প্রদীপটি হাতে নিয়ে, দেওয়ালে খোদিত গজরাজের মূর্তির বাম দিকের গজদন্তে চাপ দিলেন। ধীরে ধীরে পাশের দেওয়ালটি দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে দুই দিকে সরে গেল, আর মাঝে একজনের সমান ফাঁকা অংশ সৃষ্টি হল। ভিক্ষু রত্নদীপ্ত ওই ফাঁকা স্থান দিয়ে দেওয়ালের অপর প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালেন। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গিয়ে বাঁক নিয়েছে। পথটি বিহারের বাইরে যাওয়ার গুপ্তপথ। এমন গুপ্তপথ বিহারে আরও আছে, যেগুলি জানেন একমাত্র সংঘাধ্যক্ষ ভিক্ষু জ্ঞানশ্রী। এই গুপ্তপথের সন্ধান তাকে কেউ দেয়নি, নিয়তিই এই পথ দেখিয়েছে।

প্রদীপ হাতে সেই অন্ধকার গুপ্তপথে পা বাড়ালেন তিনি।

|| চার ||

মূল সংঘরাম থেকে অতিথি নিবাস খানিক তফাতে। ত্রিতলবিশিষ্ঠ মূল সংঘরামটি আয়তনে বেশ বড়। মহাস্থবির জ্ঞানশ্রী এবং সংঘচালক অভিজ্ঞ শ্রমণদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ছাড়াও কিছু প্রাচীন ভিক্ষুরা এখানে থাকেন। বৃহৎ একটি পাঠাগার, প্রার্থনা মন্দির এই অংশেই অবস্থিত। আরও রয়েছে বিবিধ কক্ষ। প্রার্থনা-মন্দিরটিতে ভিক্ষুরা প্রার্থনাকালে উপস্থিত হয়। অপর আরও কয়েকটি মন্দির রয়েছে, সেগুলিতে সংঘাধ্যক্ষ এবং প্রাচীন আচার্যদের অনুমতি ব্যতীত সকলের প্রবেশ অসাধ্য। অক্ষোভ্য দেব, যিনি জাগতিক সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা নিজে ধারণ করে জগতকে সুখপ্রদান করেন—তিনি হলেন এই মহাপদ্মরাগ বিহারের অধিষ্ঠাত্র দেবতা। আচার্য এবং ভিক্ষুদের অভিরুচি অনুসারে বিবিধ প্রার্থনা মন্দিরে পূজিত হন মহশ্রী তারা, বোধিসত্ত্ব, লোকেশ্বরনাথ প্রমুখেরা।